প্রাপ্তিস্থান

ন্যাশনাল বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড

বার বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট

কলকাতা তিয়াত্তর

অধ্যাপক লোকরঞ্জন দাশগুপ্ত
শ্রদ্ধাস্পদেষু

সূচীপত্র

বধ্যভূমির সিংহাসন

ঐখানে একদিন প্রকাশ্যে
নরবলি হ'ত ঘণ্টা বাজিয়ে
কখনো গোপন মন্ত্রপাঠে
রাত্রির নিশুতি আকাশে, রক্তের ঝর্ণাতলায়
রাজার গলায় মালা পড়তো।
অলৌকিক হাততালিতে মনোনীত
একমাত্র করুণাঘন মহান পুরুষ,
যার নামে নিশান উঁচিয়ে
ভক্তের দল নগর-কীর্তনে নামে পাড়ায় পাড়ায়।

এক রাজার এক দেশ
পিতৃস্নেহে লালিত সিংহাসন একটাই।
তার দুই বাহুতে রূপোর সিংহমূর্তি খোদাই,
দশ আঙুলের মুঠিতে দশদিক বন্দী রেখে
প্রজাপালনের নামে ফতোয়া আসে।
আকাশের গায়ে গুড়গুড় শব্দে
বিদ্যুতের ফলায়
পরস্পর মেঘের লড়াই।
কালরাত্রির চোখ বেয়ে
অবিরাম জল ঝরে অফুরান ক্রোধের গর্জনে
ধন্যি রাজার দেশে শয়তান নড়ে বসে।

সন্তানের মুখ চেয়ে
কারা যেন মাটির দিকে এগিয়ে আসে
গোরা-পল্টনের তেজী ঘোড়ার মত,
আকাল ঘনায় সিংহাসনে, বেদী কাঁপে
সিংহমূর্তি চৌচির ধুলোয় গড়ায়।

পুনরায় সিংহাসন দখলের ছলে
মুহূর্তে মুখোশ লাগে মুখে,
রাজ-পোষাক বদলে যায় রঙের আড়ালে।
এখন সেই কোটি কোটি হাততালির হাত
কেমন লকলকিয়ে উঠে আসে,
শব্দ থেকে নিঃশব্দে মুঠো ক'রে
জ্বলন্ত মশালের পাগল শিখার মত।
ছুটে আসে বধ্যভূমির দিকে ;
বাতাসে হুঙ্কার ওঠে—
কোথায় ছদ্মবেশী রাজার সিংহাসন,
রাজার ঠিকানা চাই।

জন্মভূমি, তুমি কার

কান পাতলেই মায়াবী সুরের টানে
সর্বনাশা তন্দ্রা নামে চোখের পাতায়,
মাটিতে আদিম গন্ধ, উলুঘাসে উড়ে যায় সাপের খোলস।
বাতাসে বিশ্বাস নেই, সুদেল ঘুঘুর ডানা
ছায়া ফেলে রাত্রিদিন বন্ধকী ঘরের চালে,
আলপথ মরাই-এর ভাঁজে ভাঁজে, গন্ধবতী গোলার শরীরে
কোজাগরী জোৎস্নায় ঘনমেঘে ঘনায় অশনি।

ধনধান্যে লক্ষ্মীপারা পুষ্ট গৌড়ভূমি, তুমি কার—কে তোমার।

কালিমাখা লণ্ঠনের রাতে
দারিদ্রসীমার নীচে কুশাসনে বসিয়ে
কারে তুমি অশৌচের শুদ্ধিমন্ত্র দাও?
"কথায় বলে—দিনে বাতি যার ঘরে
তার ভিটেতে ঘুঘু চরে।...নে হেলান দে থাকিস্ নে;
ভাগ রেখে চাষ কর, গলা করিস্ কেনে?"
হাসি পায়—গৌর অঙ্গে লাগে না মোটে কুলোর বাতাস।
ঘুঘু তো চরালে প্রভু এতকাল বেলা অবেলায়,
গুস্তাখী এবার, বসুমাতা ঋতুমতী হলে
রক্তে বোনা ধান সব খাসদখল নেবে।

প্রিয়তমা কিষাণী মাটির বুকে
তীক্ষ্ণফলা লাঙলের আঁচড় কেটে,
বন্য এক ভালবাসা জন্ম নেয় শস্যের শরীরে।

ধনধান্যে লক্ষ্মীপারা পুষ্ট জন্মভূমি, তুমি কার—কে তোমার।

কবিতা-প্রেমিক, তোমাকে

"কে আছে এমন, অদৃশ্য পরিচয়
লিখে রাখে কবিতার সাথে ;
এত রাগে ভালবেসে শিল্পীর হাতে
দূর থেকে চেয়েছে সে কবিতার জয়।"

চিঠি নয় যেন টুকরো কবিতা।
ঐ হাতে ছেড়েছো অক্ষয় তূণ
বুকে এসে বেঁধে। ফিরাবো কি দিয়ে ; শব্দের ভণিতা
কেবল ছন্দে বুনে শুদ্ধরসে খেলে না আগুন
কবির মগজে। আজন্ম মাটিমাখা এই দেশকাল
মানুষেরই নামে বুকেতে লালন করে পৃথিবীর ভার।
কবিতার কারিগর কালি মেখে চাষ করে, মুখোশের মায়াজাল
ছিঁড়ে দিয়ে নিজেকে জানায়, বন্ধু খোঁজে কবিতার।
একদা যুদ্ধে যায় কবি, সহচর কবিতা-প্রেমিক ;
কলমের কাব্যময় কালির স্রোতে
ভেসে যায় রক্তমাখা লাশ। দু'চোখে নির্ভীক
গাঢ় প্রেম খেলা করে সৃষ্টির উৎস হ'তে।

তুমি তো কাঙাল বড়। কথা দিয়ে আঁকা ছবি
শুধু চিত্রময় অলংকারে নিজেরে সাজাও ;
বেশবাসে রুচি নেই, ক্ষুধাতৃষ্ণা ভুলে যাও।
হায় রে অবুঝ প্রেম, এই বেয়াদপ কবি
অনন্ত কবিতা-প্রেমে দেশ জুড়ে চায় যে স্বরাজ ;
তুমি তার প্রথম সৈনিক, তীক্ষ্ণ তীরন্দাজ।

ঘরশত্রু

বাইরে থেকে কে আমাকে তাক করে আছে
আমি তা জানি,
কারণ তাকেই আমি জন্মের সকাল থেকে দেখছি
ওৎ পেতে বসে আছে আমার সুখের দরজায়।
পথের কাঁটা হয়ে পায়ে পায়ে জড়িয়ে
ক্রমশ অন্ধকারে জাল ফেলা তার কাজ
আমি তা জানি, দেখেছি।
আমার ভাবনা তাকে নিয়ে নয়
কারণ সে যা করতে চায়
আমি তার মুখ না দেখেই
ভিতরে ভিতরে তার জন্য তৈরী হয়ে থাকি।

কিন্তু যখন আমি সকলের হাত ধ'রে
দরজার বাইরে গিয়ে
তাকে শেষবারের মত দেখে নেব ভাবি,
ঠিক তখনি ঘরের মধ্যে
কান-কলহ আর বাঁকা ইশারাতে
সমস্ত ইচ্ছের ঘাড় ধরে কারা যেন বসিয়ে দিতে চায়।

যত ভাবনা আমার সেইখানে।
এখন সেই ভিতর ঘরেই
আমাকে কাঁটা বাছাই-এর কাজ নিতে হয়;
তবেই শেষবারের মত বাইরে যাওয়া সাজে
শেষবারের মত।

স্মৃতিময় শ্রাবণের ভোরে

কে কাঁদে এই শ্রাবণের মধ্যযামে।
নিশুতি বাতাস ভাঙে শোকে
যেন বয়ে যায় অবিরাম মহানীমবৃক্ষের ফাঁকে।

এত জল ছিল নাকি নীলদীঘি চোখে তার
একদিন চৈত্রের খরাগায়ে এলোচুল বাউল বাতাসে
চুপিসাড়ে এসেছিলো ইস্তেহার হাতে
বুকের জমাট রক্তে দুরন্ত ঝর্ণার ডাক দিয়ে ;
সেই তার শেষযাত্রা—বুঝিনি তখন।

বৃষ্টিভেজা ঘুমঘোর চোখে এতদিন পরে
মনে হয় দেখি তারে ছুটে যায় এপাড়া ওপাড়া,
তার নামে স্মৃতিময় ভোর হয় সোনালী ধানের শীষে
বৃক্ষের শিকড়ে নামে রস, মরা নদী বানে ভাসে ;
সে ছিল মাটির গর্ভে হেমন্তের মহাগুটিবীজ
শীতে-কাঁপা নিরন্ন দেহে অবাধ উল্লাস।

আজ এই স্মৃতিময় শ্রাবণের ভোরে
হাতে হাতে তার নামে
ইস্তেহার ঝল্‌সে ওঠে উজান রোদ্দুরে।

শিকার

জঙ্গল-বন্দনা গায় নন্দ কয়াল।
সবার চোখে জল আসে, পা কাঁপে ;
তবু দোহার টানে সবাই মিলে
পেটের দায় বড় দায়, হা-ভাতে সংসার।

ক্যানাস্তারা বাজে চোরাবালি দহেরপারে ঘন জঙ্গলে,
মহাজন স্বপ্ন দেখে পান্‌সি বোঝাই গরাণ কাঠের
জলে-ডাঙ্গায় শিকার তার।
আড়াই টাকায় জনহিসাব, জেঁাকের শোষণ
সবুজ বনের গরাণ কাঠ মহাজনের মান রাখে
মা-লক্ষ্মী সিন্দুক ভরে, গলায় ঝোলে সোনার হার।
মহাজনের চোখে আগুন হাতে বারুদ,
গোলায় বাঁধা ঘামে ঝরা মান ইজ্জত।
শিকারের বেলা যায়, দহেরপারের জবর শিকার।

আচমকা বন্দনা যায় থেমে।
এক মোচড়ে নন্দ কয়াল ঘুরে দাঁড়ায়,
দোহার ছেড়ে চেঁচিয়ে ওঠে সবাই :
"হক কথা শোনেন বাবু। দাম বেড়েছে কাঠের
রোজ বাড়ালে তবেই কাম, নইলে নয়।"
মহাজনের কটা চোখে কেউটে খেলে।
: আচ্ছা হবেখন ; বেলা যায়, আগে গাছ কাটো...।

জঙ্গল-বন্দনা গায় নন্দ কয়াল।
দোহার টেনে জঙ্গলেতে ঢুকে পড়ে সবাই
"মা-জননী, জঙ্গল-দেবী মা, দেখো যেন বাঘে ছোঁয় না।"
আগে যায় নন্দ কয়াল, পিছে পিছে সব
পান্‌সি থেকে লুকোচুরি, নল হাতে মহাজন

গুড়ুম…গুড়ুম…, জঙ্গলেতে দাবানল, নন্দ গেল কার পেটে ?
হায়রে হায় ! মহাজনের দুঃখ বড়—রাঘে নিল নাকি।
জল-আগুনের মুনিশজন সবাই বুঝে পাথর হয়ে যায়।
গরাণ বোঝাই পান্‌সি চলে নিশুত নদীর জলে,
দাঁড় পড়ে ঝপাঝপ…
মহাজনের চোখ জ্বলে, জোনাক জ্বলে বোবা আন্ধারে।
কারো মুখে কথা নাই। হঠাৎ জলে পড়লো কে রে…
পান্‌সিভরা গুণতি মানুষ, মহাজন তো নাই।

নন্দ গেছে মহাজনের পেটে।
বন্দনা-গান রইল গলায়, সবাই মিলে দোহার টানে
"মা-জননী, জঙ্গল-দেবী মা
দেখো, মহাজনের জোঁক যেন আর ছোঁয় না।"

নিশুত নদীর বুকে চিরে
বুক চিতিয়ে দাঁড় পড়ে, দাঁড় পড়ে ঝপাঝপ…
আরো জোরে, ঝপাঝপ……

গোলাপবাগানে সাপ

কী যে দুঃখ মনে, অসুখ তোমার
কী কারণে বুঝতে পারি না ;
ছুঁতে গেলে অভিমানে, চিকন কথার
বাক্যজালে উঠে আসে ঘৃণা।

"আমারে ফিরিয়ে দাও গোলাপবাগান
নির্জনে খেলুক ভীরু বাতাস,
এই রূপ-রসে ডুবে থাক প্রাণ
ঘুচে যাক চৌ-দিকের ফাঁস।"

অথচ বোঝে না নারী, সুন্দরের মাটি
কালসাপ রেখেছে দখলে,
লোকালয়ে অন্ধ প্রেম গড়ে তোলে ঘাঁটি
বুক পেতে, ভালবাসা বলে।

সঙ্গ যদি না-ই দিলে, পাঁচ হাতে ফুল
বোঝা দায় তোমার অসুখ,
ছড়ানো মাটিতে এসো নেমে, ভাঙো ভুল,
দেখা দেবে প্রেমিকের মুখ।

যুদ্ধ

মাটি ফুঁড়ে বীজ ওঠে, মাথা তোলে আকাশের নীলে
ফলবান বৃক্ষ চায় দীর্ঘ আয়ু প্রাচীন শিকড়ে,
ক্ষুধার্ত কীটের বাহু হানা দেয় রসের জঠরে
এ অরণ্যে জয় কার ; যুদ্ধ সেই আদিম নিখিলে।
আত্মরক্ষা জীবধর্ম। সত্য তবে স্বার্থ ভাগাভাগি ;
বেঁচে-থাকা দ্বিধাদ্বন্দ্বে সন্ধিহীন বীরের গৌরব
সাড়া দেয় ন্যায়যুদ্ধে। পৃথিবীর ধর্মশালা সব
অস্ত্রাগার হয়ে গেলে জপতপ শেখেনা বৈরাগী।
আর এক যুদ্ধ জাগে প্রতিদিন মনের ভিতর
সংঘবোধ-নীতি নিয়ে যে ধরেছে অমোঘ নিশানা ;
তার পিছু কার ছায়া মিত্রজন সেজে দেয় হানা ?
যোদ্ধা তবে ক্ষমাহীন ; সে জানে না কে-বা আত্মপর

কলিঙ্গ শিবির থেকে কুরুক্ষেত্র মহভারতের
রক্তপাতে লিখে গেছে : লোকধর্ম সমূহ দ্বন্দ্বের।

রৌদ্ররস

একদল ফৌজিভীড়ের মত ছাউনি পড়েছে যেন
বাবুর সিংহদরজার চাতালে।
সামিয়ানার নীচে হ্যাজাক বাতি পুড়ছে অন্ধকার হটিয়ে
গেরামের মেয়ে-মরদ মিলে একজোট, গুটিসুটি শীতের রাত্তিরে।

এক রাত্তিরের জমাটি আসর—"মহিষাসুর বধ" পালা—বাবুর দয়া।
"লাথি-ঝাঁটা খাই তবু বাবুই বাঁচায়ে রাখে"—এহেন মহান মানবপুত্র
আহ্লাদে ডেকেছেন ম্লেচ্ছদের আজ নিজের কোলে।
তিনি প্রসন্ন হলে সুয্যি ওঠে গাঁয়ে, মাঠেতে ফসল;
তিনি বাম হলে ঘর পোড়ে, জমি যায় বন্ধকে।
মেয়ে-মুনিশ গতর খাটে; বাবুর রক্তে যৌবন-জোয়ার খেলে।

মা-জননী দুগ্‌গার দশ হাতে দশ মন্ত্র। বুনি দুর্লভ তন্ময় হয়ে দেখে।
প্রলয় ঘনায়ে আসে যেন—
পশুরক্তে এত তেজ, দানবের বিক্রমে বিপন্ন বসুধা
বড় অসহায় জননী—স্বর্গাদপি গরীয়সী।
তৃতীয় নয়নে তার জাগে ক্রোধ অসুর বিনাশে
যুদ্ধে যায় দেবী মানুষী গর্জনে। দশদিক হতে আসে
রাত্রিহন্তা অক্ষয় তূণ,
তাথৈ নৃত্যে দিগন্তে ছুটে যায় উড়ন্ত ত্রিশূল।

সিংহদরজার পাশ ঘেঁসে আলো করে বসে আছেন বাবু,
গোটা অঙ্গ পুলকে দোলে।
ত্রিনয়নী বুনি দুর্লভ ফুঁসে ওঠে বুকে। কোন ফাঁকে স্মৃতি হয়ে যায়—
"তুমি মোর মরদরে নিকাশ করেছো বাবু, আলের ধারে,
গত সালে মোদের ভাগা দাওনি মোটে।"
মুহূর্তেই আকণ্ঠ আর্তনাদ—বাবুর রক্তাক্ত লাশ গড়াগড়ি যায়।

যুদ্ধে যায় দেবী মানুষী গর্জনে। দশদিক হতে আসে
রাত্রিহন্তা অক্ষয় তূণ ;
সেই রাতে রাতভোর—
সারা গাঁয়ে লক্ষহাতে বেজেছিলো একটানা ঢাকের আওয়াজ।

সেই মানুষ

প্রতিদিন সকাল সন্ধে জলছত্র কেটে
তিনি যান আড়তখানায় সাদাকে কালো করতে ;
হিসেবের দু'নম্বর খাতায়—
সুখের চাবিটি তার লুকানো থাকে।
পরহিতে দাতব্যচিকিৎসালয় খোলেন তিনি,
পাঠশালা প্রতিষ্ঠায় করতালি পান।
শহুরে-মর্যাদায় সম্ভ্রান্ত পল্লীর—
কুকুর-পাহারা বাড়ীর গাড়ী-বারান্দা থেকে
তিনি যান তিন-পুরুষের পুঁজি হাতে
শহরতলীর সস্তা জনমজুরের পট্টিতে
পত্তনী কারখানা থেকে চক্রবৃদ্ধি মুনাফা-শিকারে।
মহাজনী-সম্মান সিন্দুকে জমিয়ে,
ভাড়াটে গতর বন্ধক রাখেন পাঁচ আঙুলে,
তিনি যান আল্-পথে মানুষ শিকারে।
মহামান্য আদালতে ঘুষখেকো বুড়ো জজের রায়ে
জমি-জিরাতের দলিল নয় ছয় ক'রে
ভাগচাষীর লাশ নালায় ভাসিয়ে
নিশ্চিন্তে তিনি গ্রামসভায় মোড়ল সাজেন।

এই দেশের এই সব সজ্জন মানুষগুলোকে
একদিন চৌ-রাস্তায় দাঁড় করিয়ে
সশব্দে বলা দরকার : না, এই শেষ ; আর নয়।

তার আগে সেই মানুষ চাই,
শিরদাঁড়া সোজা রেখে
কাঁটাতারের বেড়া ভেঙে বেরিয়ে এসে
যে বলবে : হ্যাঁ, আমরা এখন প্রস্তুত।

কোথায় দাঁড়াবে বলো

বিষজলে জননীর শবদেহ ভাসে।

ঝাঁকে ঝাঁকে শত্রুসেনার মত
স্বর্গীয় জলের ফোঁটা এগিয়ে আসে।
তার সাথে ছিল না বিবাদ কোনদিন
অথচ আধমরা বিত্তহীন
অভাগা যেদিকে চায়
মজা খাল নদী-নালা জলাকার হয়ে যায়।
জল দাও চিৎকারে জীবনের অন্য নাম
পোড়া দুঃখে ছাই হয় জোয়ারের আগে,
তারপর বাঁধ ভাঙে; অবেলায়, রাগে
নিষেধ শোনে না নদী দিতে হয় দাম।

বসতির তিনভাগ মাটি নিয়ে মেটে না ক্ষুধা
যেটুকু সম্বল হাতে, দখল নিয়েছে বাঘে
এবার কোথায় দাঁড়াবে বলো জননী বসুধা।

জলের দাগ

নিবাস খুড়িগাছি, মৌজা জলস্থলী-কুলাকাশ।

শুনলুম শহর ডুবেছে এইবার। গাঁয়ের মানুষ আমি
তেমন বোধভাষ্যি জানা নেই। এ যাত্রা বাঁচায়েছেন তাই
দু'চার কথা জানায়ে রাখি:
"এই জল বাঁধ ভাঙে চোখের জলে। ভাসানের বাজনা বাজায়ে
মেনকার এত দুঃখ দেখিনি জেবনে। নর-নাগে কালযুদ্ধ,
সৎকারের চিন্তা নাই; গাঙুরের জলে ভাসে সোহাগী জনম,
চিৎপাত ভেসে যায় পাঠশালা পিস্মৃতিসদন, শ্মশানের পোড়াকাঠ
অন্নপচা কটুগন্ধে অন্নদার বিষাদ ছায়া
নিশিজাগা পেতের গোঙানী যেন বানাল বাতাসে,
মনেহয় শূন্যে বুঝি সব সুখ—পতিতপাবন।
পিছু থেকে টেনে রাখে সে এক আশ্চয্যি চোখ মাঁচাবাঁধা অবুঝ শিশু
এখন ভেন্ন যাত্রা। তার চোখে জলদাগ লেগে আছে,
তাই ফিরি, মাটিতেই ফিরে আসি নাড়ী-ছেঁড়া টানে।
শুধু একবার সাধ জাগে, দেখি সেই কোন্‌জন
চিরকাল আগুন নে খেলায় উস্তাদ
এখন জলেও খেলে;
বানভাসি কাব্যি লেখে খবর ফলায়ে
কেচ্ছা গায় না-মানা গাঁয়ে মোড়লের গালগপ্পো নিয়ে,
খালবিল নদীর উপোসী পেটে চড়া ফেলে দিন দিন
নিজ-পেট নিকাশীর ফন্দী আঁটে,
ফি-সন জলের বাঁধ চুরি করে নাবালে নামায়..."
চোখে তার জলদাগ লেগে আছে।
এখন ভিন্ন যাত্রা;
চাঁড়ালের রাগ বাসি হ'লে কাঁপন ধরাবে।

মুক্তি

শব্দ এক, নানা অর্থে নিজস্ব প্রয়োগ।
জীবন যেখানে সুরু মৃত্যু আছে শেষে,
বৈদিক ঋষিরা কন : নিয়তির বেশে
বাঁধা সব—মিথ্যা মায়া জাগতিক ভোগ।
ত্যাগের মহিমা থেকে লালসার রোগ
ছদ্মবেশে রাখে বিষ, ছড়ায় নিমেষে ;
বাস্তব ক্ষুধার দেহ রক্তে যায় ভেসে
অমোঘ সংঘাত জেনে বাড়ে শ্রেণীযোগ।
সম্পদে সুখের মাত্রা চিনেছে ব্যাপারী
শিবিরে বিভাগ আনে সুখ ও অসুখে
কে থাকে অধীনে কার, চতুর শিকারী
অহিংস বুদ্ধের মত দাঁড়ায় সম্মুখে।
সেই থেকে মুখোমুখি ; হাতে হাতিয়ার
নয়া অর্থে মুক্তি খোঁজে শ্রমের সংসার।

আশ্চর্য দিনের সূর্য

সে এক আশ্চর্য দিনের সূর্য প্লাবনে ভাসায়।
আমাদের দুঃখ-শোক
আনন্দ-বেদনার অম্লান তিথিভোর পঁচিশে বৈশাখে
যেন পুনর্জন্ম খুঁজে পাই নষ্ট পচা লাশঘর থেকে।
অলৌকিক ধ্যানের মোহিনী-আড়াল ছুঁয়ে
ভাবি না কখনো
নৈবেদ্য সাজাবো সেই নামে,
অথবা দেবতুল্য ব্যবধানে বসিয়ে রেখে
ভাসাবো ভক্তির ভেলা সিদ্ধির সীমান্ত পারে।

"মোর নাম এই বলে খ্যাত হোক
আমি তোমাদেরই লোক,"
লৌকিক সংসার জুড়ে
এমন আশ্রয় নিয়ে কে এসে দাঁড়ায়
দারুণ দহন দিনে হৃদয়ের মাঝখানে।
"নাই, রস নাই……" ভীষণ নীরস যত কথার মন্ত্র দিয়ে
চৌদিকে চাতুর্যের জাদুখেলা।
যারা গান গায়, প্রাণে আছে মরে শুকনো কথায়;
কবিতার শুদ্ধরসে মশগুল বিলাসী পাঠক
অসীমের তত্ত্ব হেনে গুরুনাম কীর্তনে-প্রাজ্ঞ সাজে,
বৈশাখী ঝড়ের দিনে আমি তার বৈরীগান বাঁধি
রক্ত-মাংসে কবিতার কাঁটা দিয়ে বন্দী করি।
জীবন-দেবতারে এনে ঋষিকল্প গৈরিক প্রেমে
আস্থা রাখি না মনে।
সম্ভ্রান্ত ভীড়ের মাঝে ইদানীং আসর জমিয়ে
নাম, শুধু নাম নিয়ে লুটোপুটি নিরর্থ জানি।

খুঁজি তাঁরে হা-হুতাশে নুয়ে-পড়া মানুষের কোলাহলে
শতাব্দী প্রাচীন বড় নিঃস্ব মাটির শিকড়ে খুঁজি তাঁরে ;
খুঁজি তাঁরে মূঢ় দানবের নিশ্চিত পরাজয়ে
খেত-মাঠ-কলঘরে
বন্দরের ঘামঝরা সবল বাহুর পাশে
মুক্তকণ্ঠ নবীনের বেপরোয়া গানের মিছিলে।

পদানত স্বদেশের কাঁটাঘেরা প্রান্তরে
যেমন পেয়েছি তারে একদিন পদাতিক বেশে
আজও এই শুষ্কপ্রাণ চেতনার মড়করাজ্য জুড়ে
পতিত পাবন যত স্বেচ্ছাচারী ঘাতক সেনার দেশে
খুঁজি তারে, রৌদ্র-ঝড়ে মাখামাখি
বৈশাখের কোনো এক স্বাধীন সকালে।

বিত্তের মধ্যে আছি

আমরা বিত্তের মধ্যে
মাঝামাঝি শুয়ে এবং বসে আছি,
চোখে ঘুম আছে, স্বপ্ন নেই।
সামনে ছাই-ভস্ম নিয়ে
বাড়া ভাতে নবান্নের গন্ধ পাই।
মুখ আছে মানুষের মত, তবু তেমন
কথা বলার কিছু নেই।
পণ্যমূল্যের লাফালাফি
দলাদলিকে উসকে দিয়ে দাঁত বার ক'রে হাসে,
বাজার থেকে ফিরে
পকেটে হাত রেখে ব্যয়সংকোচের কথা ভাবি।
আমরা জনসভায় দাঁড়িয়ে
মৃত আত্মার শান্তি কামনা করি,
মৃত্যু ঠেকাতে একবারও অশান্ত হই না।
লুকোতে চাই, পারি না—
ধর্মঘটের খাঁড়ায় মাইনে কাটা যাবে
বড় ব্যথায় বলতে পারি না।
বিত্ত! বিত্ত কোথায়? মধ্যিখানে? রাঁয়ে?
আমরা সব শুয়ে এবং বসে আছি, দাঁড়াতে জানি না।
তৃষ্ণা আছে মরুভূমির মত বুকে;
হাতে কুড়োল নিয়ে জলদেবতার কৃপার আশায়
পাড়ে ব'সে ফালা ফালা জল কাটি,
পায়ের তলায় কী-যে আছে—
ফাঁদ না মাটি; বুঝতে পারি না।

রাজকাহিনী

যমদুয়ারে কাঁটা দিয়ে
ফিরলে রাজার বেশে,
তুমি মহান হবে বলেছিলে
ন্যাংটা প্রজার দেশে।
শপথ নিয়ে বসেছিলে,
হাড়-হাভাতের দলে
খুশীর জোয়ার আনবো দেখো
রাজ্যশাসন বলে।
দস্যি-দানোর ঘুম ঘুচিয়ে
কথা ছিল দণ্ড দেবে
নিশাকালের ভূত তাড়িয়ে
আলোর মশাল হাতে নেবে।
ত্রাস-ছড়ানো পাগলা ঘোড়া
লোহার জালে বন্দী ক'রে
কথা ছিল আবাদ হবে
স্বপ্নে-রাঙা নতুন ভোরে।
ভাবনা এখন, সবাই রাজা
টানাটানি সিংহাসনে,
যুদ্ধে যাবার বাজনা বাজে
ভয়ে মরে আপনজনে।
ন্যাংটা প্রজার আকাশ জুড়ে
মেঘ জমেছে ভারী,
রাজা এখন নিজের বুকেই
বিঁধিয়েছেন তরবারি।

এক টুকরো পুরানো ইস্তেহার

"শুভদিনের পুরুত সেজে একদল ভক্ত
চালকলা গুছিয়ে নেবার জন্য
ভুলমন্ত্রে ঘণ্টা নেড়ে যাচ্ছে,
এদের ভণ্ডামি আমরা দেখছি।
সিংহদরজার ধার ঘেঁসে
একদল হা-পিত্যেশ রাজছত্রলোভী
জিভের জল ফেলছে ;
এদের রসনা কতদূর পিচ্ছিল হতে পারে
আমরা তাও দেখছি।
আখেরে কত ধানে কত চাল
কোথায় কতটা জল গড়িয়ে যাচ্ছে
বন কেটে বসত,
আমরা তারও হিসেব রাখছি।
সময় বুঝে প্রণামীর থালা উল্টে দিয়ে
শুদ্ধিপত্র হাতে দিয়ে বলবো :
ওহে ! আমরা রক্ত-মাংসে জনগণেশ,
এ মন্দিরে বিগ্রহের ঠাঁই নেই
ঘণ্টা নাড়া বন্ধ করো।
সিংহদরজায় আজ থেকে তালা পড়লো,
এসো—জিভের জল মুছে আবাদে নামি
মাঠ-ঘাট-পাহাড় ভেঙে
নতুন দিনের ইস্তেহারে
মহাকালের ফসল ফলাই।"

আশ্রয়

কোথায় আশ্রয় চাও বিন্না যুদ্ধে ছেড়ে দিয়ে মাটি ?
আড়ালে শত্রুর ছায়া রক্তের সোহাগে ওঠে বেড়ে
নিশিদিন ছলা-কলা চোরাপথে গড়ে তোলে ঘাঁটি।
কতদূরে যাবে ভেসে ?   কালসাপ পায়ে পায়ে ফেরে,
আজন্ম বসতি কেন পরবাসে ঠিকানা হারাবে।

বিপন্ন নাবিক জানে বাতাসের কোন গতিভার
মাস্তল কাঁপাবে ঝড়ে, কোথায় নোঙর বাঁধা যাবে ,
জলযুদ্ধে জয়ী হ'লে পারঘাটে তবেই উদ্ধার।
মাটি থেকে উৎখাত, কল থেকে ছুটির নোটিশ
নির্বাসনে নিয়ে যাবে দাস ভেবে শ্রমের শরীর ?

জোট বিনা একা একা হা-হুতাশে কোন্ সে নবীশ
খুঁজে ফেরে আত্মসুখ ?   কবিও বেতাল পথে হেঁটে
মাতাল প্রভুর ঘরে শয্যা নেবে বাসি বিষ্ঠা চেটে ;
ঠিকানা বিকিয়ে গেলে ধ্বস নামে গোপনে গভীর।

তদন্তে জানা গেল

চল্লিশ বসন্ত

আর মরাচাঁদ মাথায় নিয়ে

শেষবারের মত

সে ঘরে ফিরছিল।

মুরারি ঘোষের পুকুর পাড়ে

ঝাপসা আলোয়

আচমকা আটহাতের

বেড়ি পড়ল গলায়…,

সে চলে গেল।

ঘরে তার বিধবা মা, ভালবাসার জন।

আপিসের দারোয়ান মতি

ঝড়-বাদলের সাথী,

এক যুগের কেরাণী-জীবনে তার

লাল দাগ পড়েনি কখনো।

সে ঘৃণা করতো

ঘুষখেকো বড়বাবু

ফিরিঙ্গী বাঙালী

আর উঠতি ফেরেব্বাজ ভোটের ভিখারী।

ভালবাসতো যতীন মাষ্টারকে

যিনি শিখিয়েছেন :

সত্যের জন্য প্রাণ যায় যাক।

আপিস আর পাড়া

পাড়া আর আপিস…,

সাতে-পাঁচে-না-থাকা

চাপা যৌবন

কোনদিন রোদ্দুরে ভাঙেনি পাথর
বাগানে স্বপ্নের জ্যোৎস্নায়
দু'দণ্ড বসেনি কখনো।

একলা সে নিরুদ্দেশ হয়েছিল সাগরদ্বীপে,
শোনা যায়—
সেই থেকে যতীন মাষ্টারও ঘরছাড়া।

তদন্তে জানা গেল,
পাড়ার রতনমণি
শান্তিবাহিনী বিশুর দল
চেয়েছিল গোপন খবর :
'বেজন্মা কম্যুনিস্ট যতীনের মুণ্ডু চাই।'

মাষ্টারের কথা মনে রেখে
সে সোজা হয়ে দাঁড়িয়েছিল
বেঁচে থাকার জন্ত ;
আজ তাই নিজেই খবর।

শ্যামলীর জন্য

ঘুমঘোর অন্ধকারে
সারা চোখে নক্সী-কাঁথা-স্বপ্ন জেগে থাকে
সপ্তর্ষী-নক্ষত্র যেন অহংকারে
ডুবে যায় ক্রমাগত ভোরের আকাশে।
ডোরাকাটা রোদ্দুর, আলোছায়া দিয়ে
ঘিরেছে চৌদিক যেন গরাদের মত ;
আমি ছিঁড়ে ফেলি লৌহজাল যত
রক্তকণা ছুটে যায় অশ্ববেগে স্মৃতির শিকড়ে।
আমি তারে জানি
নতজানু ভিক্ষা তার ছিল না স্বভাবে।
বুকভরা মায়াময় বৃষ্টিপাত, জ্যোৎস্নার ভিতরে
শ্রমের সংসার গড়া সাধ ছিল তার,
মুখে তার পুরাতত্ত্ব জরিপের দুরন্ত সোহাগ ছিল
মানুষের নামে। ফাঁদ-পাতা সময়ের ঋণ
সোয়াস্তি দেয়নি তারে, সুখ কোনোদিন
রক্তপায়ী অসময় বন্দী ক'রে নিয়ে গেল তারে
পাশবিক অরণ্যের শব্দহীন হিম কারাগারে।
রক্তকণা ছুটে যায় অশ্ববেগে স্মৃতির শিকড়ে,
আমি তারে জানি শ্যামলী নামে,
বুকভরা মায়াময় বৃষ্টিপাত, জ্যোৎস্নার ভিতরে
শ্রমের সংসার গড়া সাধ ছিল তার,
নতজানু ভিক্ষা তার ছিল না স্বভাবে।
কাপালিক প্রেমে যত যার উল্লাসবাণী
তুচ্ছ, বড় তুচ্ছ জানি,
তারে আমি ফিরাবো একদিন, আমারই নিশ্বাসে।

সূর্যসন্তান

তুমি তো জলন্ত প্রাণ
আন্দোলিত জয়ের নিশান।
পৃথিবীর কাল-রাত্রি ভাঙা ভোরের পথিক,
তুমি নির্ভিক
দিগন্ত মুঠোয় ক'রে ছুটে-আসা বীর পদাতিক।
মাটির জড়তা ভাঙো, ভাঙো বীজ
গভীর শিকড়ে
আলো জেলে জন্ম দাও আতুর ঘরে
দীপ্তিবান দামাল শিশুরে।
ক্লান্তি নেই, ক্ষোভ নেই অনন্ত আকাশ জুড়ে
ঘুরে ঘুরে সবকিছু জয়—
কে আছে এমন যোদ্ধা, নেই ভয়
মুখোমুখি অস্ত্র হানে তোমার বিনাশে।
কল্পনায় রাহু ভাসে
মেঘের ফাঁকে। অবিচল আছ তুমি
আছে কোটি প্রাণ নির্ভয়
সোহাগে মরণ চুমি।

কেরাণীর রাজবেশ

১.

এখানে কবিত্বের কারুকাজ নিয়ে নেশাখোর তোমাকে
ডাকে নি কেউ। কপালের ঘাম
মূল্যবান গোদরেজ টেবিলে গচ্ছিত রেখে
তবেই চরণামৃতের মত মাইনেটা মিলে যেতে পারে।
মুনাফা শিকার বিংশশতাব্দীর সবচেয়ে কঠিন বিজ্ঞান,
বেনিয়ার কূট-অর্থনীতি। ইতিহাসের মধ্যযুগ থেকে উঠে আসা
আজ্ঞাবহ কেরাণীর কপালে ভাড়াটিয়া ছাপ।
মহান পবিত্র দায় জীবনের, করণীয় একটাই—
দশ থেকে পাঁচের কাঁটায় ক্রুশবিদ্ধ অমায়িক যিশুর মত
ঝুলে থাকা। তোমার একমাত্র স্বাস্থ্যবান ঈশ্বর
তাপনিয়ন্ত্রিত চৌখুপির ভিতর সর্বদাই জাগ্রত আছেন।
তিনি তুষ্ট হলে অন্নজলে পুষ্টি তোমার,
দুয়ারে দাঁড়াবে রথ। বেয়ারা বায়না আর অবাধ্যতা
যে কোনো শান্ত শিশুর মত অবুঝ সকালে
তোমার প্রিয় পরিচিত আসনখানি শূন্য ক'রে দিতে পারে।

২.

এই একটানা কলমখানি ঘুরিয়ে যাওয়া
কেরাণী-বলদের কালিমাখা কান্নাকে
সাহস আর শক্তির বেদীতে দাঁড় করিয়ে দেবার জন্য
ঘটা ক'রে ঘণ্টা নেড়ে একজন তেজী কেরাণীকে
মালা দিয়ে অভিষেক করা হয়েছিল।
ঐ ঈশ্বরের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে কথা ছিল,
মুনাফা শিকারের কঠিন বিজ্ঞান তছনছ ক'রে
যক্ষপুরী থেকে মুক্তি পাবে সংখ্যা-চিহ্নে বন্দী যত

নামহীন মুখগুলো। কিন্তু রাজবেশে নির্বাচিত
শ্রমিক দরদীয়া যথার্থই একদিন মুকুটের লোভে
ঈশ্বরের সাথে সন্ধি ক'রে চৌখুপিতে নিরুদ্দেশ হ'ল।

৩.

রেখো গো দাসেরে মনে হে নির্বাচিত প্রভু
কেন যে মনের আড়ালে অবাধ্য কবিতার মায়াময় হাতছানি,
বাণিজ্যের কড়ি নিয়ে হেলাফেলা, হাস্য-পরিহাস
কঠোর শ্রমের বিকল্পে তর্জনী তুলে চুলচেরা তর্কে ঢুকে পড়া
মাঝে মাঝে নিজেও বুঝি না।
হয়ত এদেশে ঈশ্বরের দরবারে স্বাধীন সাচ্চা সব ধাপ্পাবাজি
রক্তের ভিতরে এক ভিন্ন ধারাপাত সশব্দে উসকে দিয়ে যায়।

৪.

সেই নিরুদ্দেশ দরদীয়া পড়েনি কখনো ম্যানিফেস্টো,
নতজানু চুক্তি সেরে মহান বিজয়গর্বে
জ্বালাময়ী কথাভাষ্যে তৃপ্তির ঢেকুর তুলে
অতঃপর নিদ্রা যান শীতল শরীরে।
স্বপ্নে মাথার পরে নেমে আসে রাংতার মুকুট
যুদ্ধে যায় একা একা তুমুল গর্জনে।
ঈশ্বরের প্রতিনিধি সব কথা শোনে না কানে
হায়! অমন অভিষেক কেরাণীকুলে কখনো সম্ভব?

৫.

কাব্য-কথা ছেড়ে দিয়ে অতঃপর সমবেত সিদ্ধান্ত :
ঐ রাজবেশ খুলে শ্রমিক দরদীয়া ঈশ্বর-নেপোকে বেত মারা হোক,
জীবন্ত কবরে গিয়ে মুক্ত হোক শেষ অভিলাষ।

জোড়কলম

বিরস দিন, সজল প্রাণ। তবু রে মানুষ তুই একবার হাপুশ-নয়নে
কাঁদ দেখি। সেই জলে একদিন মেঘ হবে। গুরু গুরু গর্জনে
ভাসাবে সংসার।

সে বড় সুখের সকাল ছিল। ঘন অরণ্য ঘিরে স্বাধীন জীবন।
মানবজমিন খুঁড়ে হাতে ছিল আশ্চর্য ফসিল। দু'পায়ে সভ্যতা
এসে ধীরে ধীরে এইখানে নিয়েছে বসতি।

বড় প্রাচীন হয়েছে এই বৃক্ষের সভাতল। বাকলে বয়সের ছাপ
বৃদ্ধ প্রপিতামহের মতো দাগ কেটে আছে। সারা দেহে
জঙ্গলের জাল, কোটরে শ্যাওলা। শাখাতে সবুজ প্রাণ
হলুদ হয়েছে একে একে। টুপটাপ ঝরে যায় নতুন জীবন।
শূন্যমাঠে সুখের বসত হাহাকারে ডুবে যায়। বৃক্ষ চাই, রস চাই
মাটির জঠরে। নিশ্বাসে যে বাতাস প্রাণ আনে মৃতের শরীরে,
সেই অরণ্যে নিয়ে চলো, চলো—আপাতত জোড়কলম বাঁধি।

এসো হে প্রাচীন মুমূর্ষু মানব, যদি পারো হাপুশ-নয়নে
কাঁদো—কেঁদে ভাসাও সংসার। তারপর যদি চন্দ্র-সূর্য ওঠে;
তারে সাক্ষী রাখো, জন্ম দাও। সে জীবন যেন আর
কাঁদে না কখনো।

আপাতত তোমার প্রাচীন দেহে দেখি, প্রাণ আছে না-কি
এসো, এই বৃক্ষরোপণের রুগ্ন দেশে, পতিত মানব-জমিন ঘিরে
জোড়কলম বাঁধি।

শিশুবর্ষের ভাবনা

১. তিথি-নক্ষত্রহীন জন্মের শিশুরা

একবারই এসেছে সময়।
ঐ দেখ্‌, বর্ষপালনের পরব জমেছে
রাজরাণীর রোশনাই দরবারে।
মূর্খ তুই ; বুঝলি না
সোহাগী জনম তোর কী দামে বিকোয়।
তোর নামে বিশ্বের তাবৎ পিতারা
গ্যাস-বেলুন উড়িয়েছে দেশ-দেশান্তরে,
স্বর্গ থেকে ফেরা
বাছাই শিশু-দরদীরা সোনার হরিণে চেপে
আসছে ছুটে ;
এবার জাতির ভবিষ্যৎ পাকা গিনির মত উজ্জ্বল হবে
তুই শুধু ক্যালক্যাল অবুঝ কাঁদিস
মায়ের বুকেতে মেঘ জমিয়ে শুধু পাহাড় বানাস।
ঐ দেখ্‌, সারি সারি
বিজ্ঞাপনে সুখী-মন কারা হাসে থলথল
হেঁটে যায় সেরা-স্বাস্থ্যের অহংকার নিয়ে।
থলথলে মায়েদের তুলতুলে শিশুরা
জন্মের ঠিকুজী রাখে সোনার সিন্দুকে।
তুই শুধু
তিথি-নক্ষত্রহীন জন্মের মাটিতে
মেঘ জমিয়ে পাহাড় বানাস…পাহাড়……
কালো মেঘের পাহাড়।

২. বলো দেখি

বলো দেখি কেমন ক'রে
রাত পোহালে দিন আসে
তারার আলো নিভে গিয়ে
সূর্য ওঠে নীল আকাশে।

বলো দেখি কেমন ক'রে
কালো মেঘের সিঁড়ি বেয়ে
গুড়ুম গুম বাজনা বেজে
জলের ধারা আসে ধেয়ে।

বলো দেখি কেমন ক'রে
ধান ফলিয়ে চাল হয়
কয়লা থেকে আগুন জ্বলে
রকেট ছেড়ে আকাশ জয়।

বলো দেখি কেমন ক'রে
ধনী-গরীব তৈরী হয়
কালো টাকা দেখতে কেমন
মোটাসোটা, নেইকো ক্ষয়?

বলো দেখি কেমন ক'রে
রক্তে ডাকে তুমুল বান
মানুষখেকো মানুষগুলো
ডুবিয়ে দেয় দেশের মান

তোরসার তীরে, রাজার দেশে

ড্রাগনের বর্ণময় তোরণ শেষে রাজার দেশ।
সীমান্ত পেরোলে
মাটির মত রাতদিনও ভাগ হয়ে যায়।
ভেবেছিলাম তোরসার জলে
রাজকীয় মুখ দেখবো নদীর দর্পণে।
ব্যর্থ ভ্রমণে বিশাল পাহাড়ও যেন ছোট হয়ে যায়,
কোন দূর মেঘের চূড়ায়
বুদ্ধের মন্দিরে প্রার্থনার গান শুনি,
টিলার কোল ঘেঁসে নেমে আসে
দুরন্ত গতিতে সামরিক যান
এরা কি অতিথি-সেনা শান্তির পারাপারে?

ফিরে আসি তোরসার তীরে।
রুগ্ন জলস্রোত শব্দহীন, রূপোলী বালির চর
দু'ধারে দুঃস্থ মানুষের পাহাড়ী সংসার,
মদেশিয়া না-কি টোটোর বসতি,
রাজবাড়ী কোন্ পথে যেতে হয়
এরা কি জানে?
রাজার প্রসাদ পায় দুবেলা দুমুঠো?

জনৈক হত্যাকারীর উদ্দেশে

গলায় লোভের ফাঁস পরিয়ে
হাতে টাকার রুপোলী অস্ত্র দিয়ে
কারা তোমাকে কাজে লাগায়
আমরা তা জানি।
যাকে তুমি ফেরৎ পাঠিয়ে দিলে
আলোর মুখ থেকে সারা জীবনের জন্যে
তারই মতো কোনো এক দুঃখময়
স্নেহের সংসার থেকে তুমি এসেছো,
তোমারও পিতার সদিচ্ছা আশীর্বাদ,
জড়িয়ে আছে তোমার সারা দেহে মনে ;
অথচ রাত্রিদিন মিথ্যা মন্ত্র দিয়ে
যারা তোমাকে তাতায়, বিষপাত্র তুলে দেয় হাতে
সেইসব নীলবর্ণ শৃগালের মনুষ্য-পরিচয়
তোমার অজানা।
তোমারই পূর্বপুরুষের রক্তের দাদন জমিয়ে তারা
অবৈধ তালুক গড়েছে, অরণ্যের ইজারা নিয়ে
সৌখিন শিকারীর আত্মগৌরবে
রায়বাহাদুরের পোষাক পরেছে,
কয়েক পুরুষ ধ'রে।

তারপর একদিন—
ডলার পেন্সের পিঠে স্বদেশী তকমা এঁটে
সিন্দুক বাঁটোয়ারা ক'রে স্বাধীনতা এলো।
ওরা 'দেশদ্রোহী'র তালিকা দিল তোমার হাতে ;
সেই থেকে খেত-খামার-কারখানা
নদীনালা গলিঘুঁজি, অন্ধকার রেলইয়ার্ড,

গেরস্থের উঠোন দাপিয়ে তুমি যৌবন হারালে ;
হাতে রইল অবুঝ ঘাতকের আত্মনাশা কারুকাজ
জানি না, তোমারো ঘরের দাওয়ায় সেদিন
জ্যোৎস্না ছিল কি-না
উৎকণ্ঠিত মায়ের চোখে নদীর ভাঙন ;
হিসেবের গরমিল হ'ল যেদিন নিজস্ব শিবিরে
হাতের উদ্যত ছোরা
তুমি ঘুরিয়ে ধরলে মরিয়া হয়ে।
কাকভোর আকাশের নিচে পরদিন
তোমার রক্তাক্ত লাশ পাওয়া গেল
পচা ডোবার ধারে।

অথচ বিস্ময় এই
তুমি জানলেই না, সময়ের সংক্রান্তিবেলায়
একযোগে দুই সন্তানহারা পিতা
পথে বেরিয়েছে ;
সেই নীলবর্ণ শৃগালের খোঁজে।

ভাঙচুর-চুর

ভাঙচুর-চুর ভাঙচুর-চুর
শিয়ালদহে পুলিশ নাচে
কার সাধ্যি পালিয়ে বাঁচে
হে ভাই, দিল্লী কতদূর,
ভাঙচুর-চুর ভাঙচুর-চুর।
কোথায় রে ভাই রেলের গাড়ী
যাবার কথা বনগাঁ-বাড়ী
পা চলে না, রাত দুপুর
ভাঙচুর-চুর ভাঙচুর-চুর।
ঘাটতি বাজেট দ্রুতগামী
টিকিট হ'ল বেজায় দামী
রেকের অভাব শুনতে মধুর
ভাঙচুর-চুর ভাঙচুর-চুর।
টাইম টেবিলে গোলকধাঁধা
রেলের পায়ে শিকল বাঁধা
রাত যে কাবার, হৃদয়পুর
ভাঙচুর-চুর ভাঙচুর-চুর।
শিয়ালদহে আয় রে শিয়াল
আয় দেখে যা রেলের খেয়াল
খোঁজ মেলে না টিকিট-বাবুর,
ভাঙচুর-চুর ভাঙচুর-চুর।
শিয়ালদহে পুলিশ নাচে
যুদ্ধ করেই মানুষ বাঁচে,
চলো ভাই দিল্লী কতদূর
ভাঙচুর-চুর ভাঙচুর-চুর।

আপন-পর

কোন্‌খানে কার আছে ঘর
কে-বা আপন কে-বা পর,
গায়ের জোরে মিটবে নাকি
কোথায় কত মাটির দর।

জান্‌ দেব তো তেল দেব না
মুখে যাদের বায়না
কুয়োর ব্যাঙের স্বপ্ন নিয়ে
দেশটা তারা চায় না।

মুখের ভাষা বুকের আশা
ভাগ ক'রে ভাই খেলছ পাশা
পাল্‌টা দানের উস্কানিতে
গোলা-বারুদ ভরছ ঠাসা।

বৃত্ত আছে কেন্দ্র নেই
নায়করা সব হারায় খেই,
খাল কেটে যায় ইচ্ছেমত
কুমীর আসবে আপনাতেই।

সন-তারিখের বিধি-বিধান
সাদা-কালো নতুন-পুরান,
এই না হলে দেশপ্রেমে
ধন্য হবে এক-জাতি-প্রাণ।

স্বদেশমন্ত্র

পুরোহিত নাড়ে ঘণ্টা
ধর্মসভার নির্বাচন
হিংসা ছেড়ে জীবনটা
দিয়ে যা রে বিসর্জন।

কে কে যাবি আয়
ভাবিসনে রে বেলা যায়।
পাঁচ-শালার ঐ রাজা-উজীর
ছুটে ছুটে যায়,
হাতে নিয়ে চামরদোলা
নামাবলী গায়।
মন্ত্র হল অহিংসা
ধিন-ধিন তা-ধিন-তা
নেচে কুঁদে আয় রে
পতিত পাবন গায় রে
স্বদেশমন্ত্র গণতন্ত্র
স্বর্গ-নরক ধায় রে।

ঘণ্টা নাড়ে ঘণ্টা
ধর্মসভার প্রহসন,
রাজ-রাণীদের পণ-টা
ভোট চুরিতে প্রয়োজন।

কবিতার যাত্রা

ভাঙছে মেঘ
আকাশ জুড়ে
নামছে জলের ধারা,
কার আবেগ
শব্দ খুঁড়ে
দিগন্তে দেয় নাড়া।
রাত্রিদিন
সুখ-অসুখে
কাদের জীবন-কাব্য
কোন্ প্রাচীন
রাখবে বুকে
কার কাছেতে শ্রাব্য।
মুখের ভাষা
পেশীর রাগে
মাটির রসে গড়া,
কবির আশা
সবার আগে
পাঠককে জয় করা।

যা হবার নয়

ভাবছো, আড়াল থেকে আঙুল নেড়ে
দশদিগন্তে বারুদের ফানুস উড়িয়ে
রাগী আকাশটাকে
তোমার পায়ের কাছে কুর্নিশ করাবে ;
কিন্তু তা সহজে হবার নয়।
ভাবছো, তোমার মরণ-খুপরীতে
তুষের আগুনে পোড়া মন্ত্রের মানুষগুলোকে
লাগাম পরিয়ে গোলাম বানাবে ;
না, তা কখনো সম্ভব নয়।
যতই তুমি ঘাম-রক্তে-বোনা মাঠের শরীরে
বিষপোকা আর ঘুঘুর ফাঁদ পাতো,
শিকড় বড় গভীরে তার মেলেছে সংসার
নাড়ীতে বাজে আজন্ম প্রার্থনা ;
না, কিছুই অত সহজে
এলোমেলো এলিয়ে যাবার নয়।
তুমি ভাবছো
তীক্ষ্ণ তোমার নখের ডগায়
এক মুহূর্তে কালির আঁচড় কেটে
ভূগোলটাকে পোষ্য ভেবে গ্রাস করবে,
হলুদবরণ দ্বীপান্তরে ইচ্ছেমত
চালান দেবে বন-বসতি মান-সম্ভ্রম
না ; না তা কখনো হবার নয়,
হবে না।

কীসের সই

সোনাদানার হাঁড়িকুড়ি
কালোটাকা ঝুড়ি ঝুড়ি
খোলা চোখে যায় না ধরা
পাচ-আইনের নাড়ীভুঁড়ি।

কালা-আইনে হাত-কড়া
জেল-হাজতে বাঁচা-মরা
গর্জে যত বর্ষে কই
খুনীরা খায় রসের বড়া।

বাঁধা-বুলির শুকনো খই
স্বর্গ-সুখের ম্যাজিক মই
ফাঁস জড়িয়ে ধাঁধা লাগায়
ডুবছি যেন, পাই না থই।
ছলা-কলায় মন ভুলায়
চোরণী আবার কীসের সই।

অন্ধজনে দেহ অন্ধকার

হে ঈশ্বর,
অচেনা অরূপরতন ; অক্ষম ঈশ্বর
তুমি অন্ধজনে আরো ঘোর অন্ধকার দাও।
কোন্ সে মূঢ় কবির বাসনা
অন্ধপ্রেমে আলোর প্রার্থনা ?
ধিক তারে !
দানবীয় আদিম বর্বর কিছু থাকে,
প্যাঁচার বাহন নিশুতি খোয়ারি
নিলাজ মনুষ্যজনম তার কসাইখানায়।

যারা চোখে দেখে,
দেখায় অন্যকে সাদা-কালো মন্দ-ভালো
তারাতো অভ্রান্ত শিকার বহুদিন
ঐসব পেশাদারী শিকারীর অবাধ্য ছিলায়।
কিন্তু যারা অন্ধ
সম্ভবত তারা বেশী দেখে শিকারীর অদম্য লালসা
তাই একালের রাজসভা-ব্যাধের নির্দেশে
অন্ধজনও মার খায় পশুর মতো ;
বেদম বেহুঁশ পড়ে থাকে রাজপথে
সভ্যনগরীর অহিংস শান্তিবনে।

হে ঈশ্বর
তোমার অক্ষম ধার্মিক রাজত্বকাল ফিরায়ে
নিয়ে এসো ঘনঘোর অরণ্যের কাল,
সেই ভালো
অন্ধজনে দেহ আরো হিংস্র অন্ধকার।

ভেসে যায় ভোরের বাতাসে

এইবার তুমি পরিষ্কার বুঝে নিলে, শত্রুর সাজ-পোশাক কেমন।
তোমাকে শক্ত হয়ে দাঁড়াতে গেলে মনের মধ্যে মন
এবং হাতের মধ্যে হাতিয়ারটাকে টানটান শান দিয়ে
সোজাসুজি বলতে হবে: "আয়, দেখা যাক কে কত লড়িয়ে
কার সুতোর তালে তুই নাচিস, দেখি একবার।"

চকচকে ফলার মত রোদের ছুরি বসিয়ে অন্ধকার
ছিন্ন ক'রে তোমাকে দিগন্ত অবধি মশাল হাতে যেতে হবে।
সর্বনাশা ধস আর চক্রান্তের নীল ছোবল বুকে নিয়ে নীরবে
পাথর হয়ে বসে আছে যেখানে সারি সারি শতাব্দীর সাদা সাদা কংকাল—
তোমাকে সেইখানে যেতে হবে। গুহা-মানুষের আদিম সকাল
এখনো এই সভ্য সড়ক বেয়ে, সূর্যসাক্ষী তিল-তর্পণ সেরে
কাঁচা মাংসের ভোজসভায় উল্লাসে উদ্বাহু, নেচেকুঁদে ফেরে।
তোমার পরীক্ষা সেইখানে। বর্ণচোরা বান্ধবেরা সভায় ও স্বভাবে
রাজনৈতিক কূটাভাসে, মার্গীয় ধর্মের গেরুয়া কেতাবে
মহান শান্তি আর নির্বাণের চোরাগোপ্তা কুমবিং ঘটিয়ে
ভক্ত সাজে! পোশাক বদলে যায়, দাঁতে-নখে বিষ থাকে ছড়িয়ে।

তোমাকে দাঁড়াতে হয় সেইখানে শিকারী বাঘের মতো।
বাঁকাচোরা পায়ের ছাপ ধরে যারা ছড়িয়ে ছিটিয়ে রেখেছে ক্ষত
গুহার দেয়াল থেকে স্বাধীন কেল্লার পথে; তারা এখন উলঙ্গ,
পোশাক পরে না; কেঁদে হাসায় হাসিয়ে কাঁদে। অদ্ভুত রঙ্গ
সন্ধানী সময়কে অসময়ে ঠেলে দেয়। তোমাকে শক্ত হয়ে দাঁড়াতে হয়
শেষ বোঝাপড়ার জন্য। শত্রুর বয়স হলে সে বড় নির্দয়
নির্মম খেলায় মাতে। অমনি করেই তার দিন যায় রাত্রি আসে,
ঐ জ্বলন্ত মশালে তার ছায়া পড়ে; ছাই হয়, ভেসে যায় ভোরের বাতাসে।

মরণ হতে যেন জাগি

কণ্ঠ হতে গান কে নিল।
কোন্ সে অভিমানী আত্ম-হনন,
না-কি নিষ্প্রাণ বেসুরো শাস্ত্রীয় পণ্ডিতের অক্ষম বিচার
বুকের গভীরে বালিয়াড়ী বাতাসে, রক্তের গম্ভীর শব্দের সংসারে
তোলপাড় তুলেছিল।

বাঙলার লৌকিক ছাউনি থেকে ব্রাত্যজনেরা
যে অস্ত্রে ধারালো সুরের বাণীকে
একদিন ভিন্নতর আশ্রয় ভেবেছিল ;
যেখানে কথার শরীরে প্রাণ ছিল, প্রেম ছিল, ছিলনা ফাঁকি—
বজ্রের দারুণ সম্ভ্রম, বিনম্র জলের ধারায়
আকণ্ঠ তৃষ্ণার তৃপ্তি ছিল,
সেই ভুবনমাতানো কণ্ঠ হতে গান কে নিল।

স্বাধীন না স্বেচ্ছাচারী। আরো বেশী কিছু অনাচার—
নিজেকে নিজের মধ্যে ডুবিয়ে দিয়ে কথা ও সুরের সাথে
দরদী মিলনে ছিলেন যিনি নিশিভোর প্রার্থনার মত।
শব্দব্রহ্ম ; না-কি লক্ষ্যভেদী সুরের ঘরেতে তার
নীরস বন্ধন ছিঁড়ে রাজসিক অবাধ বিস্তার
হেনেছিল চপল ধিক্কার। নির্বিচারে ভাঙে তান-লয়
ভেঙে গড়ে গানের আশ্চর্যপ্রাণ অতল রসের তাড়নায়,
নাড়ী-ছেঁড়া রক্ত চুয়ে কণ্ঠে আসে মায়াবী মন্থন।
আকাশভরা সূর্যতারার বুকে কান পেতে বসে থাকে
অবাক বিহ্বল-করা পাগল শ্রোতা।

তবুও রুদ্ধ সংগীত বিরুদ্ধ বেতাল নরকের ধ্বনিকুঞ্জ থেকে
আমাদের হাত ধরে নিয়ে যায় অমরাবতীর দিকে,

তবুও গৈরিকবেশে বিষজ্বালা কণ্ঠের গ্লানি
তর্জনী তুলে আমাদের নিয়ে যায় নির্ভুল রবীন্দ্রনাথের দিকে।

স্মৃতিবিদ্ধ দেবব্রত।
বেদম কণ্ঠনালী থেকে মরণান্তিক বেদনার মত গান ঝরেছিল,
বাঙলার ব্রাত্যজন একদিন,
কান পেতে প্রাণ ঢেলে গান নিয়েছিল
নিশিভোর প্রার্থনার মত ; বজ্রের দারুণ সম্ভ্রমে বেজে যায়—
বহুযুগের ওপার হতে বেজে ওঠে, বেজে যায়।

এখন, 'ক্লান্তি আমার ক্ষমা কর'…'তোমায় গান শোনাব' বলে
'তাইতো আমায় জাগিয়ে রাখ'।
মরণ হতে জেগে আমি গান পাঠাব, গান শোনাব…গান শোনাব·

কোনো প্রার্থনা নেই

উলুঝুল নয়নচাঁদের মতো আমি বসে থাকতে প্রস্তুত।
অন্ধকারের পতিত গলিতে কারা হাঁক পেড়ে যায়
ভালবাসার জন্য কারা বাসিফুলের মালা হাতে দাঁড়িয়ে থাকে
তাদের একবার মুখোমুখি দেখবো বলে আমি বসে থাকতে প্রস্তুত।
আমার এই ধুলো, চোখের কালি, নেশাক্রান্ত বুকের ভিতর
কোনো জলপ্রপাতের শব্দ নেই, অরণ্যের মায়াময় কোনো ছায়া নেই
শ্মশানের পোড়াকাঠের মতো সাক্ষী হয়ে বসে আছি পথের পরে
দেখি কতদূর তুমি যেতে পারো এলোচুলে নিশিজাগা বেলফুল গুঁজে.
ইচ্ছে হয় দেখি, তোমার ঐ আঁচলে কয় আঙ্গুলের আঁচড় পড়েছে
কয়গণ্ডা পারাণির কড়ি সুখের মাতুলি ক'রে ঝুলিয়ে রেখেছো ঐ বুকে।

অথচ বেশী কিছু চাইনি আমি হিমকাঁপা মাঘের রাত্তিরে।
কিছু উত্তাপ ছিলো দেহে ও মনে, বিনিময়ে কিছু উজ্জল দিনের রোদ্দুর
মুঠো ক'রে নিয়ে ছুটে যাবো চক্রান্তকারী ঐ মেঘের তল্লাটে।
কথা ছিল থাকবে পাশে ; প্রতিদিন নিজস্ব যুদ্ধের সংসার পেরিয়ে
আর এক যুদ্ধময় মাটিতে শক্ত পায়ে দাঁড়াবো দু'জনে।

সোনার চেলি গায়ে জড়িয়ে বেনিয়াপাড়ায় কে তোমাকে নিয়ে যায়
মধ্যরাতে। অনন্ত দিনের কোনো তৃষ্ণা নেই
আকুলদগ্ধ কোনো যন্ত্রণার ভাষা নেই, আঘাতে সান্ত্বনা
নেই কোনো সহচর বন্ধুর সঞ্চিত স্নেহের ছোঁয়া।
ব্যাপারী প্রেমের মদে ভরপুর নকল জ্যোৎস্নার মায়াবী দুর্গে
কে তোমাকে হাত ধরে নিয়ে গেল নিক্তি মেপে পাওনা বুঝে।

তোমাকে ফিরাবো বলে আজ কোনো নতজানু প্রার্থনা নেই।
তোমার তো ছিল না এই বেশ, রুক্ষ রুদ্রের অকরুণ ভঙ্গিমা
তবে কে তোমাকে সম্রান্ত সুখের ছলে বিষমন্ত্র দিয়ে গেল কানে।

যুদ্ধের প্রতিশ্রুতি ভেঙে দিতে অস্ত্র জুগিয়েছে যারা গোপন কলহে
এই স্বপ্নেঘেরা সংসারের প্রেম-প্রীতি-মমতা মুছে
কারুকাজ খিলান গম্বুজ ধসিয়ে দিয়েছে যারা শকুনির পাশার দানে,
তাহাদের পরমায়ু ক্ষমাহীন এই হাতে কখনো গচ্ছিত নেই জেনো।

যে পথ পায়ে ফেলে গিয়েছিলে বাঁকাচোরা ভুল ঠিকানায়
একদিন সেইখানে রণসাজে রাজার আসন পেতে বসবে মানুষ,
যুদ্ধজয়ের গৌরব নিয়ে সকলের সামনে এসে দাঁড়াবো আমি ;
সেই হিম-কাঁপা মাঘের রাত্তির আলো ক'রে তোমাকে ফিরতেই হবে।

তোমাকে ফিরাবো বলে এখন কোনো নতজানু প্রার্থনা নেই।

ওয়াচ্-টাওয়ার

১. অন্যায় আইনে
ধরে আন্
তুই কান,
হাত-কড়া
বেড়ি পরা
আর কিছু চাইনে।
পাচিলের বাইরে
যাবি না-কি
দিয়ে ফাঁকি ?
বার বার
অনাচার
নিয়মেতে নাই রে।

২. ঐ দেখ্ আয়োজন
এক এক গুলি
উড়বে খুলি
ওয়াচ্-টাওয়ারে শমন।

৩. ভাবিস্ তুই মিছে
আছি সামনে
এবং পিছে
লক্ষ কোটি জন ;
তুই জিরো-আওয়ারে
ঘণ্টা শুনবি,
ওয়াচ্-টাওয়ারে
নিজেরই শমন।

বর্গী-বর্গা

তুমি তো ভাল মানুষের পো,
ভাগ চাইতে মাথা নেয়েছো
বর্গী দিয়ে ধান খেয়েছো
বুঝেছি, আসল ব্যামো কি।
এখন জমিন থেকে ছাঁটাই
বর্গা নামে রুখতেছি ভাই,
অপারেশন-বর্গীতে তাই
পোয়া-বারোর পথ মেরেছি।

প্রযত্নে লালদীঘি, কলকাতা

চার্চ-বিশপের ঘণ্টার মত গম্ভীর মেজাজে দশটি শব্দ
ঝরে পড়ে গাঙ্গেয় কলকাতার ভোরের আকাশে।
ইতস্তত ছুটে যায় কয়েকটি রাত-জাগা পাখী
চলন্ত ট্রামের মাথা থেকে বেণীবন্ধনী খুলে যায় আচমকা ;
ঘেরাটোপ দীঘির ধারে হাজার কেরাণীর লংমার্চ যেন,
রুট-মার্ক ধরে এগিয়ে চলেছে, সারি সারি জরুরী ছাউনিতে।

আপাতত গচ্ছিত ঠিকানা সূর্যাস্ত অবধি—
প্রযত্নে লালদীঘি, কলকাতা পিনকোড সাত লাখ এক।
এখন অট্টালিকা জুড়ে বাণিজ্যিক লেনদেন
কেরাণীর ওয়ার্কশপ কাগজে-কলমে,
পণ্যের উদ্বৃত্ত মূল্য আর লভ্যাংশের দুরূহ লড়াই।
বাইরে রোদ্দুর-পোড়া কৃষ্ণচূড়া কর্কশ কাকের ডাকে
ঝরে পড়ে, পিষে যায় এলোমেলো পায়ের চাপে।
ওধারে ফুটপাথে একপায়ে দাঁড়িয়ে পরিশ্রমী বেকার যুবক
অফুরান চাকুরীর ফর্ম ফেরী করে নিশ্চিত আশ্বাসে,
'গ্রামের গরীবদের প্রতি' 'খাজনা আদায়ের কাছারী'
দিব্যি বিকিয়ে যায় বাঙলার দেশী ফল সফেদার সাথে ;
পিছনে বিজ্ঞাপন মারিও না দেওয়াল জুড়ে
সাদা-কালো-লাল-নীল বলিষ্ঠ অক্ষরে
শোভাযাত্রা-সমাবেশ ডাক দেয় শহীদ মিনারে।
আর. বি. আই. গেটে টাঁকশাল থেকে আনা
ধবধবে নোটের বদল চলে মলিন মুদ্রার ময়লা ফেলে ;
মৌমাছি-ছাপে মধু কেনে গেরস্থ-বাঙালী।
অদূরেই রাইটার্স-গাছের তলায় ভীড় বাড়ে…ভীড়
উত্তর-দক্ষিণ থেকে গেঁয়োজন দরবারে এসেছেন।

বিনিয়োগ-কেন্দ্রে আঁকাবাঁকা নিম্নবিত্ত শ্বাস ফেলে ঘামঝরা চত্বরে,
চায়ের স্টলে, পান-বিড়ি-বেচা হাওড়ার মাসীর দোকানে।
ইতিমধ্যে বিশ-তলা বাড়ীর মাথায় ঝুলে গেছে মধ্যদিনের সূর্য,
ঝিকিমিকি দীঘির জলে ফাত্‌নায় চোখ রেখে মগ্ন শিকারী।
ওপারে স্নানার্থী যত দারিদ্র-সীমার নীচে বেড়ে-ওঠা
বেহিসেবী ছেলেমেয়ে দুঃখী পরিবার কাপড় শুকোয়,
আহ্লাদে দুর্লভ ছবি তুলে নিয়ে যায় হিপি-ট্রাভেলার।
ভাঙছে সময়, ট্রাফিক জমছে পায়ে পায়ে। গান ভাসে ফুটপাথে
তিনটি জন্মান্ধের শির-ওঠা ধ্রুপদী গলায়—'যোগী ফিরে আয়',
গোলাকার ভীড় দেখে আনমনে কোনো এক বঙ্গবালা
ফিরিঙ্গী পোষাকে হেলে দুলে চলে যায় সর্পিণী-চালে।
রাজবাড়ী আড়াল রেখে ততক্ষণে দিনমণি পড়েছে নুয়ে
সেণ্ট-পল্‌স গীর্জার সবুজ শয্যায় শুয়ে থাকে চার্নক সাহেব।

লালদীঘি জেগে ওঠে, জেগে ওঠে কেরাণী জনতা। যুদ্ধ শিবির যেন
ঘণ্টার পাঁচ ঘায়ে এখুনি সশস্ত্র হবে পায়ে পায়ে মিলে।
দেওয়ালের টান টান অক্ষরে দিনশেষে সোনালী আলোর ছিলা
শোভাযাত্রা-সমাবেশে ডাক দেয়। রাজপথে কলম-সেনা
ছন্দে দ্রুত ধেয়ে চলে পাঁচ-আইন বেড়িভাঙা গম্বুজের দিকে;
বিকেলের কৃষ্ণচূড়া লাল-কালো ছায়া ফেলে দীঘির কাজল জলে।
অতঃপর হাতে হাতে ঠিকানা বদলে যায়: প্রযত্নে লালদীঘি
বেড়ে ওঠে প্রত্যেক নগরীর বুকে, দিল্লীর লালকেল্লা ভারতের নামে।

কুয়াশার গল্প

শীতের সকাল। আকাশের গায়ে মিটমিট করছে দু'একটি রূপোর
লকেট—ভোরের তারা। পাতলা দুধের সরের মতো জমাট কুয়াশা।
ফার্স্ট ট্রেন ধরে চলেছি। সামনেই পট্‌পট্‌ ক'রে গোটা দুই শব্দ,
বুঝলাম—লাইন ক্লিয়ার হলো।

এতক্ষণ চোখেই পড়েনি। নির্জন কামরার এক কোণে
খালি গায়ে অল্পবয়সী একটি ছেলে জানালার দিকে তাকিয়ে
আনমনে বসে আছে।
মাঝে মাঝে হাতের পাঁচ আঙুলে শার্সিটা ঘস্‌ছে।
মনে হলো, কুয়াশার পর্দাটা সরিয়ে বাইরেটা একবার
দেখতে চায়। সেই মুহূর্তেই চোখের সামনে ভেসে উঠলো
রঙ্গলালের তামাটে শরীরটা। আসানসোলের বুড়ো শ্রমিক রঙ্গলাল।
"এ বয়সে যা কুছু কাজ, একদম সাফা বুঝে লিবেন। কুহাশা
হটিয়ে পথ কাটতে হবে, না তো গাড্ডায় পড়বেন।"
এমনি এক শীতের সকালে রঙ্গলাল যা বলেছিল,
সে তার বয়সের কথা।

বছর পাঁচেক আগে ওঁর জোয়ান ছেলে খাদের তলা থেকে
আর ওঠেনি। ছেলে-বৌ বাচ্চা কোলে সেই যে গেল—
আর ফেরেনি। আগের রাত্রে শাশুড়ী-বৌ মিলে বেদম
'কাজিয়া' করলো। রঙ্গলালের সেবার বড় 'ব্যায়রাম',
ফুস্‌ফুসের ভুল চিকিৎসায় তাঁর চোখের নজর কমেছে কিন্তু
গলার বাজখাই আওয়াজ একটুও কমেনি।
খনিতে তাঁর ডাকনাম "সর্দার"। "য়ুনিয়নের" মজদুর
হামেশাই তাঁকে ঐ নামে ডাকে। সর্দারের দুঃখ—
মালিকের "ভাড়ুয়া" য়ুনিয়নের বাহাদুর আদমী হামিদকে খুন করেছে।
এমনি এক শীতের সকালে ইস্টিশনে গাড়ী ছাড়ার আগে

রঙ্গলাল যা বলেছিলো সে তাঁর বয়সের কথা।
"একরোজ কুহাশা সাফ্ হো যায়গা, আগে বাঢ়তে চলো।"
দু'চোখের কাচদুটো কাপড়ের খুঁট দিয়ে মুছে সে ঠায় তাকিয়ে রইল।

হঠাৎ আবার লাইন ক্লিয়ারের শব্দ হলো। চেয়ে দেখি—
ছেলেটা দু'হাত দিয়ে আড়মোড়া ভেঙে চোখ রগড়াচ্ছে।
ততক্ষণে বাইরে রোদ উঠেছে।

সে রক্তের

সে এক হাড়-কাঁপানো দিন গেছে।
সব বুঝেও তুই চামুণ্ডাকে চুমু দিয়েছিস
শ্মশানের ছাই মেখে হর-গৌরীর ঘর পেতেছিস।
সেই ফাঁকে সব নন্দী-ভৃঙ্গী
একে একে ঘাড় মটকে তোর হাতেতে ভেট দিয়েছে,
আর একসাথে তুই ঢেঁড়া পিটিয়ে
জয়ধ্বজা উড়িয়েছিস শকুন-ঘেরা আকাশেতে।
তারপর একদিন,
মিলন-বেলার কালবেলাতে
ভুল বুঝে তুই বেরিয়ে এলি অন্ধকারের দরজা ঠেলে।
এখন তোর আলগা-প্রেমের মাটির ঘরে
আপনা থেকেই ধস নেমেছে।

তবু তোর রক্তে এই,
হাড়-কাঁপানো দিন বুঝে তুই ভুল ধরেছিস
আসল-সত্যি জানতে।

বদল

ঘরের ভিতরে ব্যাধির চোরাসিঁধ কাটা বহুদিন,
তবু সে বাইরে থেকে
জানলা দরজা খোলা রেখেছিল
আলো-বাতাসের ঝাপটা লেগে
যদি ঘুণপোকাগুলো মরে।
উঠোনে ফুলের বাগান ক্রমশ শুকিয়ে আসছে
তলে তলে তার ধস নেমেছে,
তবু সে জল ঢেলেছে আশায় আশায়
যদি একদিন যৌবন ফুটে ওঠে।
ঘরের ভিতর ব্যাধির চোরাসিঁধ কাটা বহুদিন।
এক বদ্যির কথামত
গাছ-শিকড়ের সন্ধানে সে ঘুরে বেড়ায় বনবাদাড়,
জীবনটা সে ফিরে পাবে তার বদলে।
ঘুরে ঘুরে একদিন সেই গাছের সঙ্গে দেখা,
অথচ অবাক-করা ছবি
এই অরণ্যে সবই প্রাচীন, রুগ্ন দেহ
সবুজপাতা হলুদবরণ পড়ছে ঝ'রে এলোমেলো।
হতাশ মনে ঘরে ফেরার পথে
তার খেয়াল হ'ল :
মিথ্যে খোঁজা হাওয়ায় হাওয়ায়,
শিকড়সহ বাঁচতে গেলে
মাটিটাকেই বদলে দিতে হবে।

কবিতার মুক্তি চাই

কবি ও কবিতার ধর্মাধিপতি—আত্মীয় পাঠক
শুরুতেই মার্জনা চেয়ে রাখি বেলাজ ভঙ্গীতে।
এই অধম কলমচি হয়ত বা আপনার চেনা, কখনো বা পড়েছেন
দু'এক ছত্র কবিতা, সব কাজ সেরে ছুটির বিকেলে;
মার্জনা চাওয়ার অর্থ এই নয় আমি মেঘ থেকে বৃষ্টি দিতে পারি না কখনো
মরুভূমি শ্মশানের গায়ে লতাগুল্ম বৃক্ষের আবাদ জানি না,
পারি না আপনার বুকের ভিতর শব্দের ঘাই তুলে আগুন লাগাতে
অথবা সারা ঋতু বয়ে যায় নিষ্ফলা, পারি না অমোঘ স্বরে গান শোনাতে।
আমি জানি শব্দ থেকে শব্দের অতি ধীর মিহিজাল বোনা
নাভিকুণ্ড থেকে উঠে আসা যন্ত্রণার বোবা ভাষ্যপাঠ
সঙ্গোপনে মগজে চালান দিয়ে সারা দেহে তেজস্ক্রিয় বারুদ সন্ধান;
বড় ভাব-ভাবনার 'শাশ্বত বাণী' জানা নেই। সংসারে রেখেছি যত্নে
সাদামাটা-ল্যাংটা-মেদ-চর্বিহীন কাঁচাপাকা অর্থময় শব্দের মহাগুটিবীজ,
ছন্দে ধরি হাহাকার ক্ষুধাতৃষ্ণা মারী ও মড়ক বড় বেতাল ইঙ্গিতে
ফালাফালা পাঠকের দেহমন-মৃত্তিকার কোষে কোষে ঋতুগত সোহাগে
জন্ম দিই চেতনার সমুদ্র-সন্তান।

'ধীরে—যদি অনুমতি হয়, সসম্মানে নিবেদন করি;
এই যে একটানা শ্বাসকষ্ট, গন্ধময় হাতুড়ীর নিদারুণ দাপাদাপি
বেঢপ বেআইনী কথায় কবিতা-রমণী বুকে উদ্ধত আঘাত
কালজয়ী কবিতার কাজ নয়, কবিরও ব্যর্থতা।
মনে পড়ে "পাখী সব করে রব···" অথবা নিষ্কাম সঙ্গীতে
"মরণরে তুঁহু মম শ্যাম সমান" তীব্র বেগে ধেয়ে যায়
অনাদি অনন্তকাল। শিল্পরস চুয়ে পড়ে কানের গভীরে,
আসলে কবিতার মুক্তি চাই স্বপ্নমাখা সুন্দর "পদ্যের" শরীরে।

কবি ও কবিতার ধর্মাধিপতি—
যথার্থই মুক্তি চাই কবিতার, কবিরও বটে।

মুক্তি; মুক্তি চাই নিরর্থক শব্দের মায়াজাল থেকে, সটান সজীব
ভঙ্গীতে প্রপিতামহের প্রাচীন শ্বাসরোগ থেকে, আইনের বেড়াজালে
বজ্জাত কবির ছদ্মবেশ থেকে, অনড় অনাদিকালের অন্ধদশা থেকে
মুক্তি চাই গতির আবেগে। এভাবেই কবিতার স্বপ্নযাত্রা।
সপ্তডিঙা মধুকরে মানুষের বিবেক-বাণিজ্য-বিজ্ঞান, ঈর্ষা-প্রেম,
পতন-উত্থানে সভ্যতার পরিণত শ্রেণীযোগ, অস্ত্রের গৌরব,
যুদ্ধবিরোধী শান্তিবৈঠক, এ্যাটমের এ্যানাটমি বিশ্লেষণ, শিল্পের অহংকার।
এভাবেই কবি ও কবিতার মুক্তি আসে আগুয়ান জনস্রোতে
মরণ-বিজয়পোতে দখলী অস্ত্রসাজে কবিতার রণতরী ছাউনি ফেলে,
নিরক্ষর ঘুটিমারা বাতাসের ভাষা থেকে এই দেশে
চারণের ছন্দরসে প্রাণপ্রিয় নিশ্বাসের নিরাপত্তা ঘিরে
কবিতার স্বাধীন সংসার, পোষ্য তার পোড়-খাওয়া আত্মীয় পাঠক।
এভাবেই মিলেমিশে শব্দ-অর্থ-অলংকার-প্রতিমার চালচিত্র
শিল্পরসে শুদ্ধ হয় রক্তে-মাংসে দোল-খাওয়া নিবিড় চুম্বনে।
সে এক অদ্ভুত নেশা তাড়া করে স্বদেশের জল-হাওয়া বাদাবন ফুঁড়ে;
কবিতা মানে না ভয়, লোকলজ্জা নিন্দাবাণী পণ্ডিতের কূট কথাজাল
লৌকিক ধ্যানেতে বুঁদ, ঘুরে ফেরে সাতসিন্ধু-দিগন্তের জয়ধ্বজা হাতে।
কিন্তু দুঃখ বড়, এ কেবল খোলামাঠে অক্ষম বিবৃতি ঘোষণা।
জাতশিল্প, উলঙ্গ কখনো নয়, আব্রু তার সবখানে,
খাঁজে খাঁজে দেখা যায় সূক্ষ্ম কারুকাজ, পুলকে পাঠক মাতে আনন্দরসে,
কাব্য বাঁচে দীর্ঘজীবী কবির হাতে।
কবিতা-পাঠক জানে কবিতার স্বাদ। চোখে তার উলঙ্গ কয়েক কোটি
নিষ্প্রাণ জলছবি। দু'বেলা জন্ম নেয় মরে যায় কারুকাজশূন্য শিশু।
নিশ্চুপে কবিতার সমাধি জাগে পোড়াদেশ মৃত্তিকার গর্ভ হতে;
ক্ষীণায়ু কবির জ্বালা কণ্ঠে নেয় বিষ। তারস্বরে ডাক দেয়—
অমরাবতীর লাজলজ্জাহীন নির্মাণ-কুশলী মানুষেরে।
সে এক আশ্চর্য নেশা তাড়া করে স্বদেশের জল-হাওয়া বাদাবন ফুঁড়ে
এভাবেই মুক্তি আসে পাঠকের, কবিতা-কবির।